চণ্ডীমঙ্গল

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী দুঃখের কথা লিখলেও দুঃখবাদী কবি নন

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিম্নবর্ণের হিন্দু দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যে কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে সেগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। এই কাব্যগুলি রচনার মাধ্যমে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কাছে টেনে নিয়ে আসা। স্বাভাবিকভাবে কাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। এই মঙ্গলকাব্য ধারার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারা। অনেক কবির রচনা দ্বারা চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারা সমৃদ্ধ হয়েছে। এই কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী। তিনি জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন জন্য তার কাব্য সেই দুঃখ-কষ্টের প্রক্ষেপ ধরাও পড়েছে। তাই অনেকে মুকুন্দ চক্রবর্তীকে দুঃখবাদী কবি বলতে চান। কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী দুঃখের বর্ণনা করলেও তিনি দুঃখবাদী কবি নন— জীবনরসিক কবি।

মূল চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার দু'টি খন্ড— আখেটিক খণ্ড বা ব্যাধ খণ্ড এবং বণিক খণ্ড। এরমধ্যে আখেটিক খন্ডে কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে; আর বণিক খন্ডে ধনপতি-শ্রীমন্ত-খুল্লনার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের আলোচ্য কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে মুকুন্দ চক্রবর্তী অনেক ক্ষেত্রেই দুঃখের প্রসঙ্গ এনেছেন। আমরা মূলত ১) কবির আত্মপরিচয় অংশ, ২) পশুগণের গোহারি অংশ এবং ৩) ফুল্লরার বারোমাস্যা অংশ— এই তিনটি অংশে দুঃখ-যন্ত্রনার ব্যাপারটি লক্ষ্য করি।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীতে বসে তার কাব্যটি রচনা করেন। এই সময় ভারতবর্ষে মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বের কারণে শান্তি বিরাজ করলেও প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাদের অত্যাচারের প্রকৃতি কিরূপ ছিল তা এই কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মপরিচয় অংশটি থেকে আমরা জানতে পারি। কবি জানিয়েছেন মোগল সম্রাটের অধস্তন কর্মচারী ডিহিদার মামুদ শরীফ এবং রায়জাদা উজীরের অত্যাচারে কবির জন্মভূমি সেলিমাবাদ পরগণার তাবৎ প্রজাসাধারণ সদা ভীত, সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করত। এই অত্যাচারর শিকার কবি নিজেও হয়েছিলেন। তাই তিনি তার নিজের সাত পুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ করে এক অজানা মুলুকের উদ্দেশ্য পাড়ি দিতে বাধ্য হন। তাঁর সেই পথে ছিল দস্যুভয়, অপরিসীম পরিশ্রম ও ক্লান্তি। কবি জানিয়েছেন—

''তৈল বিনা কৈনু স্নান করিনু উদগ পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।''

অর্থাৎ কবি তেল ছাড়া স্নান করেছেন, পুকুরের জল পান করেছেন এবং শালুক ডাটা চিবিয়ে ক্ষুধা মিটিয়েছেন; কিন্তু বাচ্চারা ভাতের জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে। এরপর কবি কাহিনির মূল অংশে কালকেতু কতৃক পশুদের অত্যাচারের বিবরণ দেওয়ার পর পশুদের দুঃখ যন্ত্রণার বিবরণ দিয়ে 'পশুগণের গোহারি' নামে একটি অংশ রচনা করেছেন। অংশটিতে আমরা দেখি কালকেতুর অত্যাচারে জর্জরিত পশুরা নানাভাবে দেবী চন্ডীকে তাদের দুঃখের কথা জানাচ্ছেন। যেমন হাতি বলেছে—

''বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে ঠাই নাই অরণ্য ভিতর।।''

অর্থাৎ হাতির শরীরই যে বেঁচে থাকার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হাতির বক্তব্য থেকেই জানা যায়। আবার ভালুক দেবীর কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলেছে—

''উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।''

ভালুক নিরীহ পশু হয়েও যে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিল তা তার উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এছাড়াই বনের আরও অনেক পশু দেবীর কাছে তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করেছে।

'ফুল্লরার বারোমাস্যা' অংশটিতে কালকেতু গৃহিণী ফুল্লরা সুন্দরী রমণীরূপী দেবী চন্ডীকে তার বারোমাসের দুঃখের কথা নিবেদন করেছেন। এই নিবেদনে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রত্যেকটি মাসই ফুল্লরার কাছে কী অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে হাজির হয়, ফুল্লরা তার বিবরণ দিয়েছে। কাল বৈশাখ মাসের দুঃখের কথা নিবেদন করে সে জানিয়েছে—

''বৈশাখ হইল আগো মোর বড় বিষ।
মাংস নাহি খায় সর্ব লোক নিরামিষ।।''

অর্থাৎ কালকেতুর শিকার করে নিয়ে আসা যে পশুর মাংস বিক্রি করে ফুল্লরার সংসার জীবন অতিবাহিত হত, বৈশাখ মাসে বেশিরভাগ লোক নিরামিষ খায় জন্য সেই মাংস কেউ কেনে না। আবার মাঘ মাসের বর্ণনায় ফুল্লরা জানিয়েছে এই সময় কুয়াশায় বনে পশুরা লুকিয়ে পড়ে জন্য কালকেতু কোন শিকার পায় না। একারণে তাকে অভুক্ত থাকতে হয়। এইভাবে বারোমাসের যন্ত্রণার কথা ফুল্লরার বারোমাস্যা অংশটিতে আছে।

কবির আত্মপরিচয়, পশুগণের গোহারি এবং ফুল্লরার বারোমাস্যার অংশগুলি ছাড়াও একাব্যে হরগৌরির জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে আরও অনেক জায়গায় দুঃখের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনাগুলি দেখলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হয় মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর জীবনে দুঃখকে সর্বস্ব বলে মেনে নিয়েছেন জন্য তার কাব্যে বারবার দুঃখের প্রসঙ্গ এসেছে। তাই তিনি দুঃখবাদী কবি।

কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তীকে দুঃখবাদী কবি বলা যায় না। কারণ সাহিত্যে দুঃখবাদ আধুনিক জীবনজাত এক দৃষ্টিকোন। মানুষের বিষয়গত বা মনোগত অতৃপ্তি দুঃখবাদের মূল। যিনি জীবনে দুঃখকেই একমাত্র সত্য বলে জানেন; দুঃখের পরে জীবনে আবার সুখ আসতে পারে এই বিশ্বাস যার মনে নেই অর্থাৎ জগৎ দুঃখময়, জীবন দুঃখময়, দুঃখ ছাড়া জগতে আর কোন সত্য বস্তু নেই; সুখ বলে যা দেখতে পাওয়া যায় তা কেবল মায়া মাত্র, বস্তুত সুখের কোন অস্তিত্ব নেই— এমন বিশ্বাস যার মনে দৃঢ়মূল তাকেই দুঃখবাদী বলে। মুকুন্দ চক্রবর্তী এরূপ বিশ্বাসে আস্থা রাখেন নি। তিনি তাঁর কাব্যে দুঃখের বর্ণনা দিলেও বরাবরই সেই দুঃখকে অতিক্রম করে যাবার কথা বলেছেন।

আমরা চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আত্মপরিচয় অংশটিতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর দুঃখের কথা জানতে পারলেও একথা জানতে পারি যে, কবি সেই দুঃখকে অতিক্রম করে আড়রা গ্রামের জমিদারের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন এবং সেখানে থেকেই তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচনা করেন। পশুদের উপর কালকেতুর আক্রমণ এবং পশুদের দুঃখ-যন্ত্রণা এই কাব্যে প্রজাদের উপর শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচারেরই রূপক। কিন্তু আমরা দেখি পশুদের দুঃখের কথা শোনার পর দেবী চন্ডী তাদের অভয়বাণী দিয়েছেন এবং কালকেতুকে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে ব্যাধ থেকে রাজায় রূপান্তরিত করেছেন। ফলে সেখানেও দুঃখ দূর করার কথা এসেছে। আমরা দেখি রাজ্যস্থাপন করার পর কালকেতু বুলান মন্ডলকে আহ্বান করে বলেছে—

''শুনো ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুণ্ডল।।
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিনসন বহি দিও কর।।''

অর্থাৎ কালকেতুর মাধ্যমে মুকুন্দ চক্রবর্তী বুলান মন্ডলকে দুঃখ দূর করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আর ফুল্লরার বারোমাস্যা আসলে সুন্দরী রমণীরূপী দেবী চন্ডীকে সতীন ভেবে ফুল্লরার মেয়েলী ইচ্ছার প্রকাশ। সে স্বামী সুখে সুখী ছিল বলে অত যন্ত্রণার মধ্যে কালকেতুকে অন্য রমণীর সাথে ভাগ করতে চায় নি। তাই সেই সুন্দরী রমণীটিকে নিজের দুঃখের কথা বলে তার সতীন হওয়া থেকে নিরস্ত্র করতে চেয়েছে।

এভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে বারবার দুঃখের কথা বললেও দুঃখকেই জীবনের মূল বলে মেনে নেন নি। সবসময় সেই দুঃখকে অতিক্রম করে যাবার কথা বলেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী মানুষের প্রতি বরাবরই বিশ্বাস রেখেছেন। তাই আমরা দেখি খল হলেও ভাঁড়ুদত্তের প্রতি কালকেতু অতটা নিষ্ঠুর হতে পরেনি। এটাই কবির জীবন দর্শন। সুতরাং দুঃখের বর্ণনা দিয়ে তার কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেও তিনি দুঃখবাদী কবি নন— জীবন রসিক কবি।

মুরারী শীল ও ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিম্নবর্ণের হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করে যে সকল কাব্য রচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে সেগুলি মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। এই মঙ্গলকাব্যের বেশ কয়েকটি ধারা প্রচলিত ছিল যার মধ্যে একটি অন্যতম ধারা হল চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারা। এই চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারা আখেটিক খন্ড ও বণিক খন্ড— এই দুই খন্ডে বিভক্ত। চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার বেশ কয়েকজন কবির আমরা পরিচয় পাই। যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী। কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীকে শুধু চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার নয়; সমগ্র মঙ্গলকাব্যের এমনকি সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিত্বের শিরোপা দেওয়া হয়। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে যে সকল কারণ আছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে কালকেতু বা ফুল্লরার মত সহজ সরল চরিত্র যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি মুরারী শীল বা ভাঁড়ুদত্তের মত কূট চরিত্রেরও ছবি আঁকাতে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আমাদের আলোচ্য আখেটিক খন্ডে ব্যাধ কালকেতুর দেবী চন্ডীর কৃপায় রাজা হয়ে ওঠার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কালকেতু রাজা হওয়ার পথে যে সমস্ত চরিত্রের সম্মুখীন হন তাদের মধ্যে দু'জন হলেন মুরারী শীল এবং ভাঁড়ুদত্ত। এই দু'টি চরিত্রই ছিল খল প্রকৃতির— তারা কালকেতুকে ঠকানোর চেষ্টা করেছিল। এরমধ্যে মুরারী শীল ছিলেন বণিক; তিনি সোনা-রূপার ব্যবসা করতেন। আর ভাঁড়ুদত্ত হলেন চালচুলোহীন এক দরিদ্র ব্যক্তি, যে পরিশ্রম করার বদলে লোককে ঠকিয়েই জীবন যাপনের কথা ভাবত।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনিতে দেখা যায় দেবী চন্ডীর কৃপায় কালকেতু সাত ঘড়া ধন ও একটি আংটি পান। দেবী চন্ডী তাকে জানিয়ে দেন যে, সেই আংটির মূল্য সাত কোটি টাকা। এই আংটি বিক্রির উদ্দেশ্যে কালকেতু মুরারী শীলের বাড়িতে যান। কিন্তু চতুর মুরারী শীল ভাবে কালকেতু হয়ত তার কাছে মাংসের বাঁকি টাকা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এসেছে। এজন্য তিনি বাড়িতেই আত্মগোপন করেন এবং তার স্ত্রী কালকেতুকে জানান—

''ঘরেতে নাহিকো পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুরা গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার।।''

কিন্তু এরপর আড়ালে থেকে মুরারী শীল তার স্ত্রী ও কালকেতুর কথোপকথন থেকে জানতে পারেন যে, এখানে প্রাপ্তি যোগের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তিনি আর লুকিয়ে থাকতে পারেন না এবং খিড়কির দরজা দিয়ে কালকেতুর সামনে এসে হাজির হন। কালকেতু তাকে আংটিটি দিলে দেবী চন্ডীর স্বপ্নাদেশ স্বত্ত্বেও তিনি কালকেতুকে জানিয়ে দেন—

''সোনা রূপা নহে বাপা এ ব্যাঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করিছ উজ্জ্বল।।''

কালকেতুকে এভাবে বিভ্রান্ত করে দিয়ে তিনি এর মূল্য নির্ধারণ করে বলেন

''রতি প্রতি হইল বীর দশ গন্ডা দর।
দুই যে ধানের কড়ি পাঁচ গন্ডা ধর।।
অষ্টপণ পাঁচ গন্ডা অঙ্গুরীর কড়ি
বাকি আর মাংসের ধারি যে দেড় বুড়ি।।''

কিন্তু দেবী চন্ডীর কাছে কালকেতু এর আসল মূল্য জেনে গেছিল, তাই এই মূল্যে তিনি কিছুতেই অংটি দিতে রাজী হন না এবং সেখান থেকে চলে যেতে চান। সম্পদ হাতছাড়া হচ্ছে দেখে মুরারী শীল কালকেতুকে বলেন—

''ধর্মকেতু ভায়া সনে কইনু লেনা দেনা।
তাহা হইতে ভাইপো হয়্যাছ সেয়ানা।।''

যাইহোক অবশেষে দেবী চন্ডী মুরারী শীলকে আংটির উচিৎ মূল্য দেবার নির্দেশ দিলে তিনি কালকেতুকে উচিৎ মূল্য দেন এবং কালকেতুকে জানান যে, তিনি এতক্ষণ তার সাথে পরিহাস করছিলেন।

এভাবে আলোচ্য কাব্যে মুরারী শীল স্বল্প স্থান জুড়ে অবস্থান করলেও মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যে তাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত করেছেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে খলতা, শঠতা, লোক ঠকানো শুধু যে আমাদের সমাজেই নেই; আমাদের অনেক আগে মুকুন্দ চক্রবর্তীর যুগেও ছিল তার প্রমান এই মুরারী শীল।

আলোচ্য কাব্যে মুরারী শীলের অবস্থান স্বল্প হলেও অনেকটা স্থান জুড়ে আছেন ভাঁড়ুদত্ত। এই ভাঁড়ুদত্ত শুধু চন্ডীমঙ্গল কাব্যের নয়; মধ্যযুগের সৃষ্ট সমস্ত খল চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একালের অনেক সমালোচকের ভাঁড়ুদত্ত তার খলতা দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আলোচ্য কাব্যে তিনি আদতে ছিলেন বাইরের লোক। দেবী চন্ডীর আনুকূল্যে কালকেতু গুজরাট নগরের পত্তন করলে ভাঁড়ুদত্ত সেখানে এসে উপস্থিত হন। মুকুন্দ চক্রবর্তী তার আগমনের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

''ভেটে লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়ান।
ভালে ফোটা মহাদম্ভ ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরসান।।''

এভাবে তিনি কালকেতুর রাজসভায় প্রবেশ করে কৌশলে কালকেতুর সাথে খুঁড়ো-ভাইপো সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানান সমস্ত কায়স্থের উপর তার আধিপত্য আছে। তিনি আপন বংশ মর্যাদার পরিচয় দিয়ে বলেন—

''কহি যে আপন তত্ত্ব অমল হারার দত্ত
তিনকুলে আমার মিলন।
দুই নারী মোর ধন্যা ঘোষ বসুর কন্যা
মিত্রে কইনু কন্যা সমর্পন।।''

তিনি আরও জানিয়েছেন গঙ্গাতীরস্থ সমস্ত কুলীন তার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে। তার এইসব কথা বলার উদ্দেশ্যই হল তিনি কালকেতুর কাছে মোড়লের পদ পেতে চান। তবে কালকেতু আগেই সেই মোড়লের পদ বুলান মন্ডলকে দিয়েছিলেন।

মোড়লের পদ ভাঁড়ুদত্ত পাক আর না পাক তিনি কালকেতুকে পরোয়া না করে নিজে নিজেই মোড়ল হয়ে ওঠেন এবং কালকেতুর হাটের ব্যবসায়ীদের অতীষ্ট করে তোলেন। তিনি ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বলে, ঠকিয়ে, ভয় দেখিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করেন। কবি লিখেছেন—

''পসরা লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ী।
যত দ্রব্য লয় তার নাহি দেয় কড়ি।।''

শুধু বিনামূল্যে দ্রব্য সংগ্রহ করাই নয়, ভাঁড়ুদত্ত দোকানিদের গালিগালাজ করেন—

''লন্ডে ভন্ডে গালি দেয় করে শালা শালা।
আমি মহা মন্ডল, আমার আগে তোলা।।''

ফলে সকল ব্যবসায়ী একযোগে কালকেতুর কাছে ভাঁড়ুদত্তের নামে অভিযোগ জানান। এতে কালকেতু ভাঁড়ুদত্তের মোড়লী কেরে নেন, ফলে ভাঁড়ুদত্ত খেপে যান এবং গর্জন করে বলেন—

''হরিদত্তের ব্যাটা হই জয়দত্তের নাতি।
হাটে লয়্যা বেচাব বীরের ঘোড়া হাতি।
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।।''

এরপর ভাঁড়ুদত্ত সোজা চলে যান কলিঙ্গরাজের কাছে এবং কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। ভাঁড়ুদত্তের চতুরতায় ও ফুল্লরার বোকামিতে কালকেতু কলিঙ্গরাজের হাতে বন্দি হন।

অবশেষে দেবী চন্ডীর কৃপায় কালকেতুর বন্দিত্ব ঘোচে এবং কলিঙ্গরাজের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। সুযোগ বুঝে ভাঁড়ুদত্ত আবার কালকেতুর কাছে আসেন এবং নাকি কান্না কেঁদে জানান—

''তুমি খুড়া হইলা বন্দি অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরলুঁ সব দুখ
দশ দিক হইল অবদাত।।''

তবে কালকেতুর কাছে ভাঁড়ুদত্তের এই অভিনয় ধরা পড়ে যায় এবং তিনি ভাঁড়ুদত্তকে অশ্বমুত্রে মাথা ভিজিয়ে, ভোতা খুর দিয়ে মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে দুই গালে চুন কালি মাখিয়ে, গাধার পিঠে উল্টোমুখে বসিয়ে সারা শহর ঘুরিয়ে শাস্তি দেন এবং তার বংশ মর্যাদা কেড়ে নেন; কারণ তিনি রাজপুত হয়ে নিজেকে কায়স্থ নলে প্রচার করতেন।

এভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তী চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটি উপস্থাপন করেছেন। সমালোচক প্রমথনাথ বিশি মুকুন্দ চক্রবর্তীর একমাত্র ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটিকে বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র হিসাবে মন্তব্য করে বলেছেন—

''* * * কোন কোন চরিত্র চিত্রনে কবি বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মমতার চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন। এমন একটি বোধকরি একমাত্র চরিত্র, একমাত্র চরিত্র ভাঁড়ুদত্ত, অন্তত একমাত্র মনুষ্য চরিত্র।''

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তার পিছনে অনেকেই এখানে মুকুন্দ চক্রবর্তীর সমাজ সচেতন মনোভাব, কাব্যটিতে উপন্যাসের লক্ষণ, বাস্তব জীবন চিত্রন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। একথা সত্য একাব্যে ভাঁড়ুদত্ত না থাকলে এই বৈশিষ্টগুলি কখনই সার্থকভাবে পরিস্ফুট হত না। এই কাব্যে খল ভাঁড়ুদত্তের সাথে যুক্ত হয়েছে অপর খল চরিত্র মুরারী শীল। তাই বলা যায় ভাঁড়ুদত্তও মুরারী শীল কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের দু'টি মহামূল্যবান সম্পদ।

বনের পশুদের মানবিক মর্যাদা লাভ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যে কয়েকটি ধারার বিকাশ লাভ করেছিল তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল মঙ্গলকাব্য ধারা। এখানে নিম্নবর্ণের হিন্দু দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার করে তাদের পূজা প্রচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই মঙ্গলকাব্য ধারার মধ্যে একটি গুরুত্বপুর্ণ ধারা হল চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারা। অনেক কবির রচনা দ্বারা চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারা সমৃদ্ধ হয়েছে। এসব কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী। তিনি শুধু চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার নয়; সমগ্র মঙ্গলকাব্যের তথা সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল মূলত চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ডের জন্য। এই খন্ডে তিনি যে সকল বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হল এই কাব্যের চরিত্র চিত্রন। দেব চরিত্র থেকে শুরু করে মানব চরিত্রের চিত্রণে মুকুন্দ চক্রবর্তী তো কৃতিত্ব দেখিয়েছেনই; তার কাব্যে বনের পশুরাও মানব চরিত্রের সমতুল্য হয়ে উঠেছে।

চন্ডীমঙ্গল যদিও দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন সূচক কাব্য, তবুও এর মধ্যে দেব মাহাত্ম্য কাটিয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মানবিকতা। তাই এখানে দেবতারা যেমন মানুষ হয়ে উঠেছেন, তেমনি বনের পশুরা যখন কথোপকথন করে তখন আর তাদের শুধু পশু ভাবা যায় না— তারাও মানুষের সমতূল্য হয়ে ওঠে। আসলে দেবী চন্ডী হলেন বনের পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যেমন তার সন্তানতূল্য বনের পশুদের আশ্রয় দেন, তেমনি রক্ষণাবেক্ষণও করেন। এই কারণে পশুরা যেমন তাকে ভক্তি বিনত চিত্তে প্রণাম জানায়, তেমনি বিপদ থেকে রক্ষা পেতে গেলে তারই শরণাপন্ন হয়।

সমগ্র চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দু'বার পশুকুলের সাথে দেবী চন্ডীকে দেখা গেছে। প্রথমবার বিজুবনে দেবী চন্ডীর সাথে পশুদের দেখা হয়। দেবীকে দেখতে পেয়ে পশুরা তাকে প্রণাম করে এবং সেইসঙ্গে তারা যাতে নির্ভয়ে, নিরাতঙ্কে থাকতে পারে সেজন্যে অভয় চায়। দেবী চন্ডী তাদের অভয় দিয়ে বলেন যে, তারা যেন নিজেদের মধ্যে ঐক্য, বন্ধুত্ব বজায় রাখে—

''যে জন যাহার শত্রু থাক মিত্রভাবে।
থাকিবে আনন্দে সবে কেহ না হিংসিবে।।''

প্রথমবার দেবী চন্ডীর সাথে পশুদের এরূপ সাক্ষাৎ হলেও দ্বিতীয়বার তাদের যখন দেবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদের চূড়ান্ত দুরবস্থা। ব্যাধ কালকেতু তার সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য আপন বৃত্তি অর্থাৎ শিকারের উপর নির্ভরশীল। ফলে বনের পশুদের সামনে দেখা দিয়েছে সমূহ বিপদ। কালকেতু ব্যাধ হলেও প্রবল পরাক্রান্ত বীর, অসীম শক্তিশালী; বনের পশুরা কিছুতেই তার সাথে এটে উঠতে পারে না। তাই পশুরাজ সিংহ এবং অন্য পশুরা একত্রিত হয়ে স্থির করে যে, কালকেতুর হাত থেকে বাঁচতে হলে দেবী চন্ডীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তারা নিজেদের অবস্থা জানানোর জন্যে চন্ডীর দেউলে সমবেত হয়—

''উপনীত হইল পশু তমাল তরুমূলে।
প্রদক্ষিণ নমস্কার করিল দেউলে।।''

সেখানেই তারা দেবী চন্ডীকে অভিযোগ পেশ করতে লাগে। সবার আগে সিংহের অভিযোগ। কারণ পশুদের রাজা হয়েও সে আজ নিরুপায়—

''ভালে টিকা দিয়া মাগো করিলে মৃগরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ।।''

ভালুকের যন্ত্রণা অন্তহীন। সে নিতান্তই নিরীহ জীব; কারও কোন সাতে পাঁচে থাকে না, তবুও বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তাকে চরম যন্ত্রণা পেতে হচ্ছে। তার স্ত্রী, সাতপুত্র, নাতিরা একে একে বীরের শিকার হওয়ায় সে আজ নির্বংশ হতে চলেছে। তাই ভালুকের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, সে নিরীহ জীব, কারও কোন ক্ষতি চায় নি, তবুও তার এরূপ অবস্থা কেন—

''উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।''

শরভ-করভ-কোক-বরাহ সকলেরই ভালুকের মতই অভিযোগ যে, তারা নিরিহ পশু হওয়া সত্বেও কেন তাদের প্রতি এই অত্যাচার। শরভ-করভেরা দ্রুত ধাবিত হতে জানলেও কালকেতুর কাছে সে ক্ষমতা তুচ্ছ। বরাহকেও মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয়েছে। কালকেতুর হাত থেকে সে স্বামী, শাশুড়ী, ননদ এমনকি কোলের সন্তানকেও রক্ষা করতে পারে নি। নানা জাতীয় সুদৃশ্য হরিণেরই সমূহ বিপদ। তাই কাতর কণ্ঠে তারা বলে–
–

''কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপ বংশে।
হরিণ ভূবন বৈরী আপনার মাংসে।।''

সজারুর জ্বালা আরও বেশি। গর্তে লুকিয়ে সে যে পরিত্রাণ পাবে তার কোন উপায় নেই— সুচতুর কালকেতু গর্তে জল ঢেলে সজারুকে বাইরে টেনে আনে। এইভাবে তাকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে হারাতে হয়েছে—

''গাঁড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালে জানি।
কি করি উপায় বীর তথি দেয় পানি।।''

যে মর্কট রামচন্দ্রের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিল, কালকেতুর হাত থেকে তারও নিস্তার নেই। আর বিশাল দেহী হস্তিনী তার ধুলি ধুসরিত কলেবরে তার কমললোচন শিশুপুত্রের কথা স্মরণ করে কেঁদে ভাসায়। তার বিশাল শরীরই তার সবথেকে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইজন্য সে দুঃখ করে বলে—

''বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে ঠাই নাই অরণ্য ভিতর।

এভাবে একত্রে সব পশু দেবী চন্ডীর দেউলে তাদের নিদারুন দুঃখের কথা নিবেদন করে। এতে ভক্ত বৎসল দেবী চন্ডী পশুদের উপেক্ষা করতে পারেন না এবং তাদের দর্শন দেন। দেবীকে কাছে পশুরা আরও একবার দেবী চন্ডীকে তাদের দুঃখের কথা জানায়। পশুরাজ সিংহের আক্ষেপই বেশি—

''আরণ্যের সেবক হইয়া সর্বত্রতে তরি।
তোমার সেবক হইয়া সবংশতে মরি।।''

দেবী সমস্ত কথা শোনেন এবং পশুকুলকে বরাভয় দান করে বলেন যে, তারা যেন ভয় না করে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে।

এভাবে মুকুন্দ চক্রবর্তী তার চন্ডীমঙ্গল কাব্যে বনের পশুদের দুঃখ যন্ত্রণার বর্ণনা দিয়ে শেষপর্যন্ত তাদের বেঁচে থাকার উপায় বেড় করেছেন। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে মুকুন্দ চক্রবর্তী সমকালীন

সমাজব্যবস্থার যে চিত্র এঁকেছেন, এখানে তারই বাস্তব বর্ণনা এসেছে। কালকেতু যেন ডিহিদার মামুদ শরীফের ছায়া অবলম্বনে পরিকল্পিত; আর পশুকুলের মধ্যে অত্যাচারিত প্রজাদের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। ভালুকের উক্তির মধ্যে কবির পরিচিত গোপীনাথ নিয়োগী স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে একটি অঞ্চলের লোকজীবন কিভাবে ওলোট পালোট হয়ে যায়, তার প্রমাণ এই পশুদের দুরবস্থা। মুকুন্দ চক্রবর্তীর এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি এই অভিজ্ঞতা পশুদের চরিত্র চিত্রণে কাজে লাগিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে এই কাব্যে পশুরা নিছক বন্যপশু হয়ে থাকে নি; তারাও জীবন্ত, বাস্তব ও মানবিক হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে সমকালীন সমাজের ছবি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সাহিত্যধারা হল মঙ্গলকাব্য সাহিত্যধারা। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেবদেবী অর্থাৎ মনসা, চন্ডী, ধর্ম, শীতলা প্রমুখদের নিয়ে উচ্চবর্ণের কবি সাহিত্যিকরা এই ধারার কাব্যচর্চা করেছেন। এই মঙ্গল কাব্যগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এগুলি চারটি খন্ডে বিভক্ত— বন্দনা অংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখন্ড এবং নরখন্ড। এর মধ্যে বন্দনাংশে কবিরা বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করেছেন। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে কোন কবি কেন নিম্নবর্ণের দেবদেবীদের নিয়ে কাব্যরচনা করতে বসেছেন তার বিবরণ আছে। দেবখন্ডে দেখা যায় কোন স্বর্গের দেবতা অভিশাপ গ্রস্থ হয়ে মর্তে পূজা প্রচারের দায়িত্ব নিচ্ছেন; আর নরখন্ডে সেই মর্তবাসী দেবতা কীভাবে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে উদ্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার করে শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে যাচ্ছেন তার বিবরণ আছে। বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্য এই চার খন্ডে বিভক্ত।

আমাদের আলোচ্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রেও কবি এই চারখন্ডে বিভক্ত করে কাব্যটি রচনা করেছেন। এই কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। এখানে দু'টি কাহিনি আছে— ব্যাধ কালকেতুর কাহিনি এবং বণিক ধনপতি ও শ্রীমন্তের কাহিনি। দু'টি কাহিনির পূর্বেই মুকুন্দ চক্রবর্তী বন্দনা অংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ এবং দেবখন্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। বন্দনা অংশে স্বাভাবিক নিয়মে কবি বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তুতি বাক্য রচনা করেছেন। আর দেবখন্ডে শিবদুর্গার ঘরকন্যার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এই কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গ্রন্থোৎপত্তির কারণ। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশটিতে তিনি কেন চন্ডীর মহিমা বিষয়ক চন্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর কাব্যে নিজের জীবনের কথা নিয়ে এসেছেন। তাঁর জীবন ছিল সমকালীন সমাজ দ্বারাই অনেকটাই প্রভাবিত। স্বাবাবিকভাবেই এই গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে সমকালীন সমাজের ছবি এঁকেছেন। এই ছবি আঁকার মধ্যে তৎকালীন মানুষের সামাজিক অবস্থান যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সে সময়ের সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি বাস্তবসম্মত ভাবে স্থান পেয়েছে। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল হয়ে উঠেছে সমকালীন সমাজের জীবন্ত দলিল।

মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে তাঁর আত্মজীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় কবিরা কয়েক পুরুষ ধরে বর্ধমানের রত্না নদীর তীরে দামুন্যা (দামিন্যা) গ্রামে বসবাস করতেন। মূলত কবিরা ছিলেন ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী। কবিদের তালুকদার ছিলেন গোপীনাথ নিয়োগী। এসময় মোগল সম্রাট আকবরের সুশাসনে সারা ভারতে মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থা থাকলেও কবির বাসভূমিতে আঞ্চলিক শাসন কর্তাদের অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। সেই অঞ্চলের ডিহিদার মামুদ শরীফ ও তার কর্মচারী রায়জাদা উজিরের অত্যাচারে সেই অঞ্চলের তাবৎ প্রজা দুর্বিষহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। এই সময়কার বর্ণনা দিয়ে কবি বলেছেন—

''পেয়াদা সবার আগে প্রজার পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়ে দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেঁচে ঘরের কুড়ালি

টাকায় দ্রব্য বেঁচে দশ আনা।।''

তবুও রাজ পেয়াদাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের কোন পরিত্রাণ ছিল না। পেয়াদারা অনায়াসে পনেরো কাঠা জমিকে এক বিঘা বলে চালিয়ে দিত। সাধারণ প্রজার অভিযোগ শোনার মত কেউ ছিল না; শুনলেও সেই অভিযোগের কোন মূল্য দেওয়া হত না। বিধর্মী শাসক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের শত্রু হয়ে ওঠে। তারা নানাভাবে প্রজাদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করেন—

''উজির হল রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া পনেরো কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।।''

এরূপ অত্যাচারের ফলে সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, মধ্যবিত্ত ও ধনীরাও সে স্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাছে তখন দামুন্যা গ্রাম দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল— তাই তিনিও চরম দুঃখে তার পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ করেন।

নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সবকিছু ছেড়ে মুকুন্দ চক্রবর্তী তার স্ত্রী, কনিষ্ঠ ভাই, শিশুপুত্র ও এক অনুচরকে নিয়ে এক অজানার উদ্দেশ্য পড়ি দেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মেদেনীপুরের হিন্দু প্রধান অঞ্চল। সবাইকে নিয়ে কবিকে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়। সেই সময় পথে নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই যাবার প্রারম্ভেই রূপরায় নামে ডাকাত কবির কাছে যে সামান্য অর্থ ছিল তাও কেড়ে নেয়। কবিরা একে একে মুড়াই নদী পার হন, তেগুটিয়া গ্রাম অতিক্রম করেন, দ্বারকেশ্বর, নারায়ণ, পরাশর, দামোদর প্রভৃতি নদনদী অতিক্রম করে ক্ষুধার্ত ও হীনবল হয়ে সপরিবারে গোচরিয়া গ্রামে এক পুকুর পাড়ে আশ্রয় নেন। এখানে কবি যে অবস্থায় পড়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

''তৈল বিনা কৈনু স্নান করিনু উদগ পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।''

এখানেই কবি দুশ্চিন্তাই, ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে এক গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমন্ত অবস্থায় দেবী চন্ডী মাতৃরূপে কবিকে দেখা দেন এবং তার মহিমা বিষয়ক কাব্য রচনার নির্দেশ দেন।

এরপর ঘুম থেকে জেগে কবি সপরিবারে রওনা দেন। শেষপর্যন্ত মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হন। মুকুন্দের শ্লোক রচনার পারদর্শিতা বাঁকুড়া রায়কে মুগ্ধ করে। তিনি কবিকে আশ্রয় দান করেন এবং নিজপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কবি অন্যান্য কাজ ও আলস্যে দেবী চন্ডীর স্বপ্নাদেশ ভুলে যান। বহুদিন পর রঘুনাথ রায় রাজা হলে কবি অসামান্য পরিশ্রমে তাঁর অভয়ামঙ্গল বা চন্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

এভাবে চন্ডীমঙ্গল কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু রচনা অংশে কবির জীবনের বিবরণ নিছক বিবরণ থাকেনি, তা তৎকালীন সমাজ-রাজনীতির ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে। এই বিবরণ থেকে আমরা তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার প্রক্ষেপ মানুষের জীবনে কীভাবে পড়েছিল তা বুঝতে পারি। সেই সময় শুধু গ্রামগুলি সাধারণ মানুষের বসবাসের অযোগ্য ছিল তা নয়; পথেও পথিকদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুকুন্দ চক্রবর্তী অত্যন্ত বাস্তব সম্মতভাবে এসব কিছুর বিবরণ দিয়েছেন।

চন্ডীমঙ্গল কব্যে উপন্যাসের লক্ষণ

উপন্যাস হল মানবজীবনের বাস্তব ভিত্তিক জীবন কাহিনির শিল্প রূপায়ন। এখানে কার্যকারণ পরম্পরা সূত্রে গ্রথিত একটি দৃঢ় ও সংবদ্ধ কাহিনি থাকে। সেই কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উপন্যাস লেখককে বেশ কিছু চরিত্রের অবতারনা করতে হয়। বিশ্বসাহিতে এবং বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব এবং

ক্রমবিকাশ ঘটেছে আধুনিক যুগে। ১) কাহিনি, ২) চরিত্র, ৩) প্লট, ৪) বাস্তবতা, ৫) পটভূমি, ৬) প্রকাশ রীতি, ৭) লেখকের জীবন দর্শন প্রভৃতি হল উপন্যাসে সাধারণ লক্ষণ।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচনা করেছিলেন মধ্যযুগের ষোড়শ শতাব্দীতে। এই সময় বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাস রচনার কোন চল ছিল না। তবুও অনেক সমালোচক মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যটিতে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পেয়ে মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তিনি এযুগে জন্মালে একজন সার্থক ঔপন্যাসিক হতেন। আমাদের আলোচনা করে দেখা দরকার মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণগুলি কতটা সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাসের লক্ষণগুলি বিচার করতে গেলে প্রথমেই আসে কাহিনি প্রসঙ্গ। মুকুন্দ চক্রবর্তী চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেবী চন্ডীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচনা করলেও একাব্যে একটি কাহিনি আছে– – এই কাহিনিটি ব্যাধ কালকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্লরার কাহিনি। কাব্যটির দেবদেবীর অংশটি বাদ দিলেও কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি হিসাবে কাব্যটি কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। আমরা দেখি ধর্মকেতু ও নিদয়ার সন্তান কালকেতু বনে পশু শিকার করে এবং সেই পশুর মাংস, চামড়া, দাঁত প্রভৃতি বিক্রি করে তাদের জীবন চলে। কালকেতুর অত্যাচারে বিব্রত হয়ে পশুরা তাদের আরাধ্যা দেবী চন্ডীর শরণাপন্ন হলে দেবী চন্ডী তাদের অভয় দেন এবং কালকেতুকে ব্যাধ থেকে রাজাতে পরিণত করেন। এইভাবে কাব্যটিতে উপন্যাসের প্রথম লক্ষণ অর্থাৎ কাহিনির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

উপন্যাসের দ্বিতীয় লক্ষণ চরিত্র। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দেব চরিত্র থেকে শুরু করে সকল প্রকার মানব চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। এখানে নায়ক এবং নায়িকা হিসাবে কালকেতু ও ফুল্লরা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বুলান মন্ডলের মত ভাল মানুষও আছে। আধুনিক উপন্যাসে যেমন খল চরিত্র থাকে তেমনি এখানে মুরারী শীলও ভাঁড়ুদত্ত খল চরিত্র হিসাবে পরিকল্পিত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে পশুদেরও মানব চরিত্রে উত্তরণ ঘটেছে। যখন মুকুন্দের ভালুক বলে—

''উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।''

তখন ভালুক আর ভালুক থাকে না, সে মানুষে রূপান্তরিত হয়। তাই দেখা যায় উপন্যাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সার্থক চরিত্র চিত্রণ তা প্রধান চরিত্রই হোক বা অপ্রধান চরিত্রই হোক; তার যথেষ্ট সমাবেশ এই কাব্যে আছে।

উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল উপন্যাসের প্লট বা কাহিনি বিন্যাস। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা প্লট বা কাহিনি বিন্যাসের অপরূপ সমাহার আমরা দেখতে পাই। এখানে কোন ঘটনাই এমনি এমনি ঘটেনি। প্রতিটি কার্যের পিছনেই আছে কোন না কোন কারণ। তাই বলা যায় এখানে কার্যকারণ পরম্পরা সূত্র ঠিকমত মেনে চলা হয়েছে। এই জন্যেই নীলাম্বর ও ছায়া অভিশাপ গ্রস্থ হয়ে ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ করেছে, ব্যাধ কালকেতু প্রথমে পশুশিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেছে, তারপরে পশুরা দেবীর কাছে নালিশ জানিয়েছে, দেবী তাদের অভয় দিয়েছেন এবং কালকেতুকে আশির্ব্বাদ করে ব্যাধ থেকে রাজায় পরিণত করেছেন। শেষপর্যন্ত রাজা কালকেতু দেবী চন্ডীর পূজা প্রচার করে অভিশাপ মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বর্গে ফিরে গেছে। এইভাবে উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্লট এখানে পুরোপুরি মেনে চলা হয়েছে।

উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবতা। চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি মধ্যযুগের ভক্তির যুগে বসে লেখা। স্বাভাবিকভাবেই এই কব্যে বাস্তবতার অতটা প্রয়োগ অসম্ভব ছিল; কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যক্ষেত্রে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছেন। এই কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে মুকুন্দের আত্মজীবনের পরিচয় অংশ, নরখন্ডের ফুল্লরার বারোমাসের সুখ দুঃখের বারোমাস্যায়, নারীগণের পতিনিন্দায় এবং দেবী চন্ডীর কাছে পশুদের দুঃখ নিবেদন করে 'পশুগণের গোহারি' অংশটি অত্যন্ত বাস্তব সম্মত উপায়ে লেখা। এই কাব্যের ব্যাধ কালকেতু, ফুল্লরা, বুলান মন্ডল, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীল, বনের পশুরা সকলেই বাস্তবধর্মী চরিত্র। এই কারণেই রমেশ চন্দ্র সেন বলেছেন—

"The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parralal in the whole range of Bengali literature."

স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি বাস্তব সম্মত ভাবে রচিত।

প্রত্যেকটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই কোন কা কোন পটভূমি থাকে, যার উপর ভিত্তি করে ঔপন্যাসিক উপন্যাস গড়ে তোলেন। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেবী চন্ডীর পূজা প্রচারই মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাই পূজা প্রচারকে পটভূমি ধরে তিনি কাব্যটি রচনা করেছেন। আর এখানেই কাহিনি চরিত্র, প্লট, বাস্তবতা সবই প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ পটভূমি এই কাব্যে আছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকাশরীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রকাশরীতি দুই রকমের— বর্ণনারীতি এবং সংলাপের রীতি। মুকুন্দ চক্রবর্তী তার কাব্যটির আখ্যানভাগ কবিতা আকারে রচনা করায় এখানে প্রকাশ রীতির ক্ষেত্রে তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ণনা রীতি গ্রহণ করেছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজন মত সংলাপের রীতিও গ্রহণ করেছেন। যদিও এই দু'টি রীতি যে কোন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; তবুও উপন্যাসের ক্ষেত্রেই প্রকাশ রীতির আলোচনা বেশি আসে। তাই বলা যায় উপন্যাসের এই লক্ষণটিও চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে।

উপন্যাসের মাধ্যমে লেখকের জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দের দর্শন ছিল দেবী চন্ডীর পূজা প্রচার করা; কিন্তু তার চেয়েও বড় দর্শন ছিল মানবিকতার প্রচার। এই কাব্যে আমরা দেখি মুকুন্দ চক্রবর্তী জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে নিজের সাত পুরুষের ভিটে মাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার এই সময়কার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন—

''তৈল বিনা কৈনু স্নান করিনু উদগ পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।''

কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী কখনোই দুঃখের যন্ত্রনাই ভেঙে পড়েন নি— দুঃখ যন্ত্রনা থেকে নিবারণের পথ খুঁজেছেন। তাই মুকুন্দের নায়ক কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করে বুলান মন্ডলকে আহ্বান করে বলেন—

''শুনো ভাই বুলান মন্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব সোনার কুন্ডল।।
আমার নগরে বস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিনসন বহি দিও কর।।''

এমনকি মুকুন্দ চক্রবর্তী দরিদ্র ভাঁড়ুদত্তেরও পুনর্বাসন করেছেন তার কাব্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মত চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়েছে।

এইভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে আধুনিক উপন্যাসের প্রায় সব লক্ষণই সার্থকভাবে পরিস্ফুট। মুকুন্দ চক্রবর্তী মধ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে কাব্যচর্চা করেছিলেন। সেই সময় ভারতীয় সাহিত্যে তো বহুদূরের কথা বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাসের প্রচলন হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই মুকুন্দ চক্রবর্তীর দ্বারা উপন্যাস রচনা করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু তিনি চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি যেভাবে রচনা করেছিলেন তা পর্যালোচনা করে সমালোচকের মন্তব্যটি অর্থাৎ মুকুন্দ চক্রবর্তী এযুগে জন্মালে ঔপন্যাসিক হতে পারতেন মেনে নিতেই হয়।